দ্বিতীয় অধ্যায়

নাট্যকর্মী বাদল সরকার : প্রসেনিয়াম থিয়েটার পর্ব

বাদল সরকার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের প্রচলিত মঞ্চব্যবস্থার মধ্যেই তাঁর নাট্যজীবন শুরু করেন। আলোচনার শুরুতে তাই বুঝে নিতে হয় প্রসেনিয়াম থিয়েটার সংক্রান্ত মূল সূত্রগুলি। এদেশের অভিনয় শিল্প মূলত দু'ধরনের মঞ্চব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে। এক, এদেশের দেশজ মঞ্চব্যবস্থা অর্থাৎ লোকনাট্য কিংবা যাত্রার মুক্তমঞ্চ। আরেকটি হলো বাঁধামঞ্চ অর্থাৎ প্রসেনিয়াম মঞ্চব্যবস্থা। লোকনাট্য-যাত্রার মঞ্চ ব্যবস্থাই এদেশের আদি রূপ। এক্ষেত্রে মঞ্চ বলতে একেবারে খোলা আকাশের নিচে, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অনাড়ম্বরভাবে আয়োজিত একটি অস্থায়ী অভিনয়ক্ষেত্র। মঞ্চের চারিদিকটা খোলা, মাঝখানের অভিনয় ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে চারিদিকে বসে দর্শক। দীর্ঘদিন ধরে এই অভিনয়রীতিই আমাদের দেশে চলে আসছে। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই ধরনের মঞ্চব্যবস্থার পাশাপাশি নতুন একটি মঞ্চ ব্যবস্থার সঙ্গে বাঙালি পরিচয় ঘটে। যাকে আমরা বলি প্রসেনিয়াম থিয়েটার মঞ্চ। অবশ্য প্রাচীনকালে আমাদের দেশে সংস্কৃত নাটক এবং নাট্যশালার ঐতিহ্যের কথা সর্বজন বিদিত। ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্রে' ভারতীয় নাট্যশালার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রয়েছে। তিনি নাট্যশালা, মঞ্চব্যবস্থা, নেপথ্য-বিধান, তার প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে ভারতীয় নাট্যশালার ঐতিহ্য কত সুপ্রাচীন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মধ্যযুগে মুসলমান শাসকদের রাজত্বকালে এদেশীয় নাট্যব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটে। কেননা মুসলমানদের কাছে নাট্যাভিনয় ছিল না-পাক। কিন্তু সাধারণ মানুষ নগর জীবনের বাইরে সুদূর গ্রামঞ্চলে, শাসকের রক্তচক্ষুর আড়ালে পূজা-পার্বণে, উৎসবে বা শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উঠোনে বা মন্দির প্রাঙ্গনে সামিয়ানা খাটিয়ে ঠাকুর-দেবতার কথা গান বা পালা আকারে পরিবেশন করত। গানের সঙ্গে থাকত কিছুটা অভিনয়। গ্রাম্য শ্রোতা ও দর্শকরা সমবেত হতেন ভক্তি ভরে ঠাকুর দেবতার কথা শুনতেন। এই ভাবেই হয়তো গ্রামীণ নাট্যাভিনয়ের ধারাটি কিছুটা রক্ষা পেয়েছিল। ফলে এদেশের অভিনয় ধারা বলতে তখন আমাদের দেশজ অভিনয়ের লোকনাটকের ধারা এবং যাত্রার ধারা। আর উনিশ শতকে এসে সেই ধারায় নতুন সংযোজন ঘটলো বিদেশি আমদানিকৃত রঙ্গালয়— প্রসেনিয়াম থিয়েটার। বলাবাহুল্য প্রসেনিয়াম থিয়েটার বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই সমাদৃত এবং বহুল ব্যবহৃত থিয়েটার। খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে মধ্যযুগের ইউরোপে প্রসেনিয়াম থিয়েটার একটা নির্দিষ্ট রূপ পেতে থাকে। এই ধরনের থিয়েটার গড়ে ওঠার ইতিবৃত্তটি সমালোচক দর্শন চৌধুরী সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি

লিখেছেন:

> ''গ্রিক শব্দ Skene, গ্রিক রঙ্গমঞ্চের যে জায়গাটায় দেবতা ডায়নিসাসের আরাধনার পর নাটকের অভিনয় হত, তাকে বলতো Skene. এই Skene-এর সামনের দিকে গোলাকৃতি জায়গায় থাকত Orchestra, তার সামনে বিশাল পাহাড়ের ঢালু জমিতে গ্যালারির মতো করে দর্শকাসন...
>
> রোমান যুগে থিয়েটারে অভিনয়ের সুবিধার জন্য Skene -এর সামনে খানিকটা জায়গা বাড়িয়ে নিয়ে প্ল্যাটফরম মতো করা হয়েছিল। Orchestra ও Skene-এর মাঝখানে এই বাড়তি অংশটুকু জড়ো হলো। Skene-এর সামনে (Pro) এই অংশ জোড়ার ফলে এর নাম হয়ে গেল Proskenion, পরবর্তীকালে সামনের Orchestra-র গোলাকৃতি জায়গা তুলে দিয়ে অর্ধবৃত্তাকার ভাবে তার অংশটি Skene-এর সামনে জুড়ে দাওয়া হলো। ক্রমে সেই অংশটি Arch (ধনুক)-এর আকারে Skene-এর সামনের অংশে যুক্ত হয়ে গেল। ...
>
> এই থিয়েটার ইংল্যান্ডে এসে ইংরেজি ভাষায় 'Skene' হয়ে গেল 'Scene'. গ্রিক 'K'- এর বদলে ইংরেজি 'C'। ইংরেজিতে নাম হলো তাই Proscenium, গ্রিক থেকে রোমান Proskenion ইংরেজিতে হলো Proscenium। এই ধরনের মঞ্চে যে থিয়েটার হয় তাকেই বলে Proscenium Theatre.''[১]

প্রসেনিয়াম থিয়েটারের উদ্ভব নিয়ে এর থেকে ভালো ব্যাখ্যা আর কী'ই বা হতে পারে, তাই এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি।

বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের উদ্ভবটি একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে—

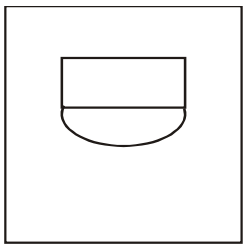

Proscenium Theatre

প্রসেনিয়াম থিয়েটারের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এই ধরনের থিয়েটারে একটি নিজস্ব বাড়ি বা প্রেক্ষাগৃহ থাকে। সেই প্রেক্ষাগৃহের একদিকে কিছুটা উঁচু জায়গায় থাকে প্রসেনিয়াম মঞ্চ।

মঞ্চের সামনে থাকে দর্শকাসন। মঞ্চের তিনদিক ঘেরা। সামনের দিক খোলা যেখানে একটি পর্দা থাকে। এই পর্দা প্রয়োজন অনুযায়ী উঠানামা করা হয়। পর্দা সরে গেলে মঞ্চের ভেতর দেখা যায়। মঞ্চের দুটিকে অভিনেতা-অভিনেত্রীর যাতায়াতের জন্য উইংস থাকে। পিছনে পর্দায় দৃশ্য আঁকা থাকে যাকে সাধারণভাবে বলা হয় দৃশ্যপট। নাটকের দৃশ্য অনুযায়ী দৃশ্যপট সজ্জিত হয়। মঞ্চে থাকে প্রয়োজনীয় সেট সেটিংস তথা মঞ্চ-ব্যবস্থা। পাশাপাশি আলোর ব্যবস্থা, যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবস্থা থাকে। অভিনেতা-অভিনেত্রীর চরিত্রোপযোগী সাজসজ্জা ও মেকআপের জন্য মঞ্চের পেছনে একটি সাজঘর থাকে, যাকে বলা হয় গ্রিনরুম। দর্শক বসে থাকে মঞ্চ থেকে দূরে, প্রেক্ষাগৃহের নির্দিষ্ট আসনে। মঞ্চটি থাকে উপবিষ্ট দর্শকের আই লেভেল অর্থাৎ দৃষ্টিতলে। আর দর্শক থেকে দূরে উচ্চতলে মঞ্চে অভিনয় চলে। এই সব-টা মিলেই তৈরি হল প্রসেনিয়াম থিয়েটার। বাংলায় নাট্যশালা বা রঙ্গালয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রসেনিয়াম থিয়েটার নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, কিন্তু তার নিজস্ব মডেলটি এখনো অপরিবর্তিত।

ইংল্যাণ্ডে যেরকম প্রসেনিয়াম থিয়েটার চালু ছিল সেই প্রসেনিয়াম থিয়েটারই ইংরেজ সাহেবরা আমাদের ভারতবর্ষ তথা বাংলায় নিয়ে এলো। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সদ্য গড়ে ওঠা নগর কলকাতায় চালু হলো প্রসেনিয়াম থিয়েটার। ধীরে ধীরে নতুন এই থিয়েটারের প্রতি বাঙালির আকর্ষণ তৈরি হলো। উনিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকেই বাঙালির বিদেশি রঙ্গালয় নির্মাণের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু থিয়েটার' কিংবা শ্যামবাজারে নবীন বসুর নাট্যশালা (১৮৩৬ সাল), প্যারীমোহন বসুর 'জোড়াসাঁকোর থিয়েটার' (১৮৫৪ সাল), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' (১৮৫৭ সাল), পাইকপাড়ার রাজাদের 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' (১৮৫৮) প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। বাঙালির নির্মিত এই সব থিয়েটারের প্রয়োজনে বাংলা নাট্যরচনাও শুরু হলো। শুরুতে অবশ্য কখনো ইংরেজি কখনো সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করে নাটকাভিনয় হত। কিন্তু অতিদ্রুত অনুবাদের যুগ অতিক্রম করে লিখিত হতে লাগল একেরপর এক বাংলা মৌলিক নাটক। এভাবে বাংলার মাটিতে ইংরেজি মডেলের প্রসেনিয়াম থিয়েটারে বাংলা নাটকাভিনয়ের পথচলা শুরু হল।

প্রথমদিকে বাঙালির এই থিয়েটার প্রীতি ছিল নিতান্তই শখ-শৌখিনতার বিষয়। কিন্তু অচিরেই সেই শখ-শৌখিনতার গণ্ডি অতিক্রম করে বাঙালি পৌঁছে গেল পেশাদারি-বাণিজ্যিক থিয়েটার পর্বে। ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলায় এই পেশাদারি থিয়েটারের জয়যাত্রা। থিয়েটার আর ব্যক্তিগত কোন গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে হয়ে উঠলো সর্বসাধারণের। ক্রমে থিয়েটারে এলো মূলধন বিনিয়োগের ধারণা। মূলধন বিনিয়োগ করে নাট্যপ্রযোজনার মধ্য

দিয়ে সেই বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে মুনাফা অর্জন। বাংলা থিয়েটার এইভাবে পরিবর্তিত হলো বাণিজ্যিক থিয়েটারে। এই ধরনের বাণিজ্যিক থিয়েটারের পরিমণ্ডলেই বাংলায় নাট্যাভিনয় চলতে থাকে। বাংলা নাট্যজগতের প্রতিষ্ঠিত প্রায় প্রত্যেক নাট্য ব্যক্তিত্বই এই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ধারণাকে গ্রহণ করেই তাদের নাট্যকর্ম চালিয়ে গেছেন। প্রসেনিয়ামের প্রচলিত মঞ্চ ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েই করে গেছেন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বাদল সরকারও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি যখন একটু একটু করে নাটক ও নাটকাভিনয়ের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেছেন, তখন তিনি প্রচলিত প্রসেনিয়াম থিয়েটারকেই বেছে নিয়েছেন। এই অধ্যায়ে আমরা বাদল সরকারের সেই প্রসেনিয়াম থিয়েটার কেন্দ্রিক নাট্যকর্মের পরিচয় তুলে ধরব।

বাদল সরকারের নাট্যজীবনের এই পর্বের দু'টি উপ-পর্ব। একটি তাঁর প্রস্তুতি পর্ব। আরেকটি প্রতিষ্ঠা পর্ব। যে সময় পর্যন্ত বাদল সরকার নিতান্ত থিয়েটারের প্রতি ভালোলাগার জায়গা থেকে বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর নাট্যকর্ম চালিয়ে গেছেন সেটাকেই আমরা 'প্রস্তুতি পর্ব' বলে চিহ্নিত করছি। মোটামুটি বাদল সরকারের নাট্যদল 'শতাব্দী' প্রতিষ্ঠার প্রাক্‌পর্বকে আমরা প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে ধরতে পারি। শতাব্দী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৭ সালে। শতাব্দী'র প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের একজন নাট্যকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যান বাদল সরকার। আবার প্রসেনিয়াম মঞ্চে যখন তিনি খ্যাতির শীর্ষে তখনই প্রসেনিয়ামের যাবতীয় যশ, খ্যাতির মোহ ত্যাগ করে থিয়েটারকে পরিচালিত করলেন ভিন্ন পথে। সে আলোচনা যথাস্থানে করা হবে। মোটামুটি ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাদল সরকার প্রসেনিয়াম থিয়েটারেই তাঁর নাট্যকর্মের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। অতএব ১৯৬৭ সালে শতাব্দী নাট্যদলের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়সীমাকে বাদল সরকারের নাট্য জীবনের প্রতিষ্ঠা পর্ব হিসেবে ধরতে পারি। প্রথমেই বাদল সরকারের নাট্যজীবনের প্রস্তুতি পর্ব নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথম পর্ব :

পারিবারিক কোন নাট্যপরিমণ্ডল থেকে বাদল সরকার থিয়েটারের জগতে আসেননি সে বিষয়ে আমরা প্রথম অধ্যায়ই আলোচনা করেছি। ফলে প্রথমদিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে, বিচ্ছিন্নভাবে যখন যা পেরেছেন ছোটখাটো নাট্যকর্মের মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত করে তাঁর নাট্যচর্চার ধারা অব্যাহত রেখেছেন। হয়তো সেগুলি নাট্যকর্মের দিক থেকে তেমন উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু তার মধ্যে একটা প্রাথমিক প্রস্তুতি আমরা লক্ষ্য করছি। একজন নাটককার, নাট্যকার হিসেবে বাদল সরকার তাঁর প্রথম প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন নিতান্ত একটি পারিবারিক নাট্যানুষ্ঠানে। সালটা ১৯৪১। 'স্লিপার্স অফ সিন্ডারেলা' নামক একটি ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ করে নিজেই নাটকের পরিচালকের

ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। নাটকটা ইংরেজি হলেও নিজের মতো করে বাঙালি চরিত্র এবং বাঙালি পরিবেশ তৈরি করে নিয়েছেন। প্রসেনিয়াম থিয়েটারে যে ধরনের মঞ্চ ব্যবস্থা থাকে, বাদল সরকার সেইভাবেই মঞ্চ তৈরি করেছেন। বাড়ির বাইরের একটি ঘরকেই তিনি প্রেক্ষাগৃহের মতো করে তার মধ্যে একটি অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করেন। প্রসেনিয়াম মঞ্চের আদলে দৃশ্যসজ্জা, উইংস, ব্যাক ড্রপ, পর্দা সবকিছু ব্যবহার করেছেন। সেই মঞ্চ ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বাদল সরকার লিখেছেন—

> ''বাইরের ঘরটা বোধ হয় ষোল ফুট লম্বা, ফুট এগারো চওড়া। দুটো তক্তপোষ পেতে তার তিনভাগের দু'ভাগ ভর্তি হয়ে গেল। বাকি একভাগে চেয়ার মোড়া পেতে প্রেক্ষাগৃহ। স্টেজের পেছনে দরজা দিয়ে পাশের ঘরে যাওয়া যায়, সে ঘরটা সবুজ-অর্থাৎ গ্রিনরুম। শাড়ি ধুতি বিছানার চাদর দিয়ে উইংস ব্যাকড্রপ পর্দা।''[২]

এই বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি মঞ্চ ব্যবস্থার উপকরণ সামান্য হলেও তার মধ্য দিয়েই বাদল সরকার যথাসম্ভব প্রচলিত প্রসেনিয়ম থিয়েটারে যে বাস্তবতার কথা বলা হয় সেটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এবং তিনি যে সে কাজে সফল হয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি লিখেছেন—

> ''... থিয়েটার—দারুণ। দর্শকদের কেমন লেগেছিল মনে নেই কিন্তু আমাদের দারুণ লেগেছিল। পুরুষ চরিত্র একটিই, অতএব আমাকে নায়ক বলা চলে। নাট্যকার, পরিচালক আর নায়ক একাধারে হয়ে আমার থিয়েটারি জীবন শুরু।''[৩]

এরকম কিছু ছোটখাটো নাট্যচর্চার মধ্য দিয়েই বাদল সরকারের নাট্যজীবনের শুরু হয়। একটি বিষয় উল্লেখ্য যে বাদল সরকারের তখনও পর্যন্ত কিন্তু পেশাদারি থিয়েটার সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও থিয়েটারকর্মের সঙ্গে তিনি সবসময়ই কমবেশি নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। কখনো এককভাবে, কখনো আবার সহকর্মী, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে এই পর্বে তাঁর নাট্যচর্চার ধারা অব্যাহত রেখেছেন। যেমন এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি 'এনাকা' গোষ্ঠীর কথা। এন্টালির একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকার সময় ফ্ল্যাটের অন্যান্য অধিবাসী এবং পাড়ার কিছু নাট্যোৎসাহী ব্যক্তিদের নিয়ে বাদল সরকার এই গ্রুপটি তৈরি করেছিলেন। এই গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে পরপর বেশ কয়েকটি নাটক অভিনয় করেন। প্রথম প্রচেষ্টা সুবোধ বসুর 'অতিথি' নাটক। এটি মঞ্চস্থ হয় কলেজ স্ট্রিটের YMC -এর পিছনের দিকের ছোট হল ঘরে। এরপর অভিনীত হয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লালপাঞ্জা'। মঞ্চস্থ হয় ওভারটুন হল-এ। এই নাটকে বাদল সরকার মুৎরুঞ্জি চরিত্রে অভিনয় করেন। এনাকা-র তৃতীয় প্রচেষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়েই 'বন্ধু' নাটক। মঞ্চস্থ হলো সুরেন্দ্র

ব্যানার্জি রোডে YWC-এর অভিজাত হল ঘরে। এই নাটকে বাদল সরকার অভিনয় করলেন প্রেমকুমার চরিত্রে। এইসব থিয়েটারের যাবতীয় খরচ করা হতো নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে। বাদল সরকার লিখেছেন—

> ''— নিজেরা যথাসম্ভব চাঁদা দেওয়া, বন্ধুবান্ধবের কাছে চাঁদাভিক্ষা এবং নিমন্ত্রণ করে দর্শক আমদানি— কলকাতার নতুন সৌখীননাট্য সংস্থার যা চিরাচরিত প্রথা।''[৪]

পারিবারিক থিয়েটার চর্চার গণ্ডি অতিক্রম করে বাদল সরকারের থিয়েটার চর্চা এভাবেই একটু একটু করে প্রসারিত হয়েছে।

'এনাকা'-র মতই এই সময় বাদল সরকার 'রিহার্সেল ক্লাব' নামের আরেকটি গ্রুপ তৈরি করেন। কর্মসূত্রে মাইথনে থাকার সময় (১৯৫৩-'৫৫) সেখানকার সহকর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তৈরি করেন রিহার্সেল ক্লাব। এই ক্লাবকে কেন্দ্র করে তিনি বেশকিছু নাটকের মঞ্চায়ন করেন। যদিও সবকটি নাটকই ধার করা। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডিটেকটিভ', 'বন্ধু', সুবোধ বসুর 'অতিথি', রবীন্দ্র মৈত্র-র 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটকের মঞ্চায়ন করেন। এর মধ্যে বাদল সরকারের রিহার্সেল ক্লাব এবং সেখানকার রিক্রিয়েশন ক্লাব যৌথভাবে মঞ্চায়ন করেন 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটক। তথ্য হিসেবে এগুলির হয়তো তেমন গুরুত্ব নেই কিন্তু এইসব ছোটখাটো নাট্যকর্মের মধ্যেই বাদল সরকারের নিজস্ব নাট্যচিন্তার কিছু উল্লেখযোগ্য দিক আমরা লক্ষ্য করি। মঞ্চের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নাট্য জীবনের শুরু থেকেই তিনি যে ভীষণ শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন। তার কিছু কিছু সাক্ষ্য পাওয়া যায় এইসব প্রযোজনা থেকে। সবকিছু তিনি ঘড়ি ধরে করতে ভালোবাসেন। কোথায় কোন সেট রাখা হবে, কত সময়ের মধ্যে সেট চেঞ্জ করতে হবে, কোন সেট কে বসাবে সবকিছুই তিনি আগে থেকেই ঠিক করে দিতেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বাদল সরকারের দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে; মাইথন পর্বের সেইসব ছোটখাটো নাট্যায়নের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বাদল সরকার বলেছেন:

> ''...পুরো ডায়াগ্রাম করে প্রতিটি সেট চেঞ্জ, যত কমপ্লিকেটেড-ই হোক না কেন, কোনোটাতে এক মিনিটের বেশি টাইম লাগবে না। ষাট সেকেন্ড। এই যে অরগাইজেশন, সোফাটা কে বার করবে, চেয়ারটা কে ঢোকাবে, সেগুলো সমস্ত একবারে ছবির মতো প্ল্যান করা, ওয়েল প্ল্যান্ড্। কাঁটায় কাঁটায় যে টাইম বলেছি সেই টাইমে আরম্ভ হয়।''[৫]

এখানে মঞ্চব্যবস্থায় বাদল সরকারের ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রয়োগের প্রতিফলন স্পষ্ট। এই

পর্ব থেকেই নাট্যচর্চায় মঞ্চস্থাপত্যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রয়োগে নাট্য গঠনকলায় একটা ধারণা তৈরি হতে শুরু করে। বলা ভালো তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দর্শনই তাঁর সামনে মঞ্চের 'স্পেস' বা পরিসরের বোধটা তুলে ধরে সাহায্য করে এই পর্বে।

রিহার্সেল ক্লাবের এইসব নাট্যায়ন থেকে আমরা লক্ষ্য করি বাদল সরকার সমবেত নাট্যনির্মাণে বিশ্বাস করতেন। পরিচালনার ক্ষেত্রে ছিলেন ভীষণভাবে গণতান্ত্রিক। তাই নাটক পরিচালনার সময় আলাদা করে পরিচালকের নাম ব্যবহার করতেন না। পুরোটাই হতো যৌথভাবে, সবার সমান অংশগ্রহণে। তিনি তাই বলেছেন—

> ''অভিনয় এবং পরিচালনায় খানিকটা দায়িত্ব ছিল, আমরা পরিচালকের নাম-টাম লিখতাম না। আমরা যৌথভাবে পরিচালনায় হেল্প করতাম আর কী।''[৬]

এই রিহার্সেল ক্লাবের সময়পর্বে বাদল সরকারের নাট্যায়নের আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় হলো থিয়েটার করার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই খরচের ব্যাপারে তিনি ভীষণ সতর্ক ছিলেন। তিনি জানতেন থিয়েটার, বিশেষ করে প্রসেনিয়াম থিয়েটারে নাটক করতে গেলে অর্থ লাগে। কিন্তু সামান্য আয়োজনে কীভাবে ভালো থিয়েটার করা যায় এটা তাকে ভীষণভাবে ভাবিয়েছিল। তাই মঞ্চ সাজসজ্জার খরচ কমানোর জন্য অনেক সময় সহকর্মীদের কাছ থেকে অভিনয়ের জন্য মঞ্চের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করতেও তিনি কোন সংকোচ করতেন না। সে কথা জানিয়ে বাদল সরকার বলছেন—

> ''... যাকে সেটের জিনিস বা প্রপ্ স্ বলি, তার জন্য কারুর বাড়িতে গেলে আমাদের চোখ ঘুরত, কোথায় একটা ভালো ফুলদানি আছে, নিয়ে যেতে হবে।''[৭]

এই সময় বাদল সরকার যেটুকু থিয়েটার চর্চা করেছেন তা 'খানিকটা স্পোরেডিকালি। খাপছাড়াভাবে।'[৮] এই সময় নির্দিষ্ট কোন নাট্যদল বা গ্রুপ তৈরি করে নয়, যখন যে রকম মনে হয়েছে অস্থায়ীভাবে গ্রুপ তৈরি করে তাঁর থিয়েটারকর্মকে অব্যাহত রেখেছেন। বাদল সরকার জানিয়েছেন, ''থিয়েটারটা যখন অভিনয় হবে, একটাই শো হবে, তখন একটা নাম দিতে হয় বলে গ্রুপের একটা নাম দেওয়া হল। একটা অভিনয়েই থিয়েটারও শেষ, গ্রুপও শেষ।''[৯] আর দলের থিয়েটারের ডাইরেক্টর বলতে বাদল সরকার তখন 'সাভেন্ট অভ্ দ্য গ্রুপ। প্রোডিউসার, ডাইরেকটর যা বলি, তার পোজিশন-টা খানিকটা তা-ই।'[১০] যে কয়েক জনের থিয়েটারের প্রতি নেশা ছিল তাদের একেবারে জোরাজুরি করে এই পর্বে থিয়েটার চর্চা চালিয়ে গেছেন তিনি।

এই পর্বে থিয়েটার করতে গিয়ে বাদল সরকার অনুভব করলেন নাটক লেখার প্রয়োজনীয়তা। তাই অন্যের নাটক কিংবা গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে থিয়েটার করার পাশাপাশি শুরু করলেন নাটক

লেখা। একবারের চেষ্টাতেই একটা সম্পূর্ণ নাটক লিখে ফেলেছেন এমনটা হয়নি। কিছু দূরে গিয়েই সে লেখা থেমে গেছে, তিনি জানিয়েছেন, ''হয়তো খানিকটা এগোলাম, আমার মনে আছে, কোনো নাটকে যেন দুটি চরিত্র খাটের নীচে ঢুকেছিল, অন্য কয়েকজন প্রবেশ করছে— ওইখানে শেষ হয়ে গেছে।''[১১]

মাইথনে যাওয়ার আগেই তৈরি করেছিলেন 'এনাকা' কালচারাল গ্রুপ। মাইথন থেকে ফিরে এসে সেই গ্রুপের কিছু সদস্য এবং কলকাতার পুরোনো কিছু নাট্যমোদী বন্ধুবান্ধব সহকর্মীদের নিয়ে তৈরি করলেন 'চক্র' (১৯৬০-৬৩) নামের আরেকটি সাংস্কৃতিক গ্রুপ। এই চক্রকে কেন্দ্র করেই এই সময় আবার বাদল সরকারের নাট্যচর্চা শুরু হয়। এবার শুধু নাট্যাভিনয় নয়, নাটক রচনার অনুশীলনও সমান ভাবে এগোতে থাকে। আর নাটক কতখানি উৎকৃষ্ট হয়ে উঠছে সেটা যাচাই করার জন্য চক্র-র সদস্যদের পড়ে শুনাতেন বাদল সরকার। 'পুরোনো কাসুন্দি' বইয়ে এ প্রসঙ্গে একটি মজাদার ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন বাদল সরকার। তিনি লিখেছেন—

> ''খাওয়া দাওয়া এবং গভীর আড্ডার পর বেশি রাতে ঘোষণা করলাম— নাটক পরে শোনাবো। চূড়ান্ত প্রতিবাদ, বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে যাবার আগে কেন বলিস নি, ইত্যাদি। আমি নাছোড়বান্দা, খাটের উপর বসে 'বড়ো পিসিমা'-র পাণ্ডুলিপি খুলেছি। ... যেই বলেছি— প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, অমনি কানুর মন্তব্য— বেশ লিখেছিস।''[১২]

কিন্তু বাদল সরকার হাল ছাড়েননি। আর চেষ্টা করতে করতেই একদিন লিখে ফেললেন প্রথম নাটক 'সলিউশন এক্স'। নাটকটির রচনাকাল ১৯৫৬। যদিও 'মাংকি বিজনেস' বলে একটি ইংরেজি সিনেমা দেখে তিনি নাটকটি লিখেন কিন্তু রচনা করলেন সম্পূর্ণ নিজের মত করে। এরপরই একে একে লিখে ফেললেন 'বড়ো পিসিমা' (১৯৫৯), 'শনিবার' (১৯৫৯), 'রাম শ্যাম যদু' (১৯৬২) নাটক। আর শুধু তো নাটক লেখা নয়, সেই সঙ্গে চলে লিখিত নাটকগুলির নিয়মিত অভিনও। তাঁর 'বড়ো পিসীমা', 'সলিউশন এক্স', 'শনিবার', 'রাম শ্যাম যদু' প্রথম 'চক্র'ই মঞ্চায়ন করে, যার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন বাদল সরকার নিজে। শুরুর দিকে এ.বি.টি.এ অর্থাৎ অলবেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর দোতলার হলঘর ভাড়া নিয়ে তাঁর নিজের লেখা নাটকের মঞ্চায়ন করতেন। অভিনয় করতেন চক্রের সদস্যরাই। তখনও টিকিট বিক্রি করে থিয়েটার করার জায়গায় বাদল সরকার পৌঁছাননি। চাঁদা তুলে, আমন্ত্রণপত্র বিতরণ করে থিয়েটার করা ছিল একমাত্র উপায়। বাদল সরকারের তখন থিয়েটারের প্রতি প্রবল উৎসাহ। চক্র-র সদস্যদের রাজি করিয়েই এ.বি.টি.এ-এর হল ঘরে একদিন নাট্যোৎসবের আয়োজন করলেন। ১৯৬১ সালের ১৮ই মার্চ, প্রবল উৎসাহে শুরু

হলো সেই নাট্যোৎসব। একে একে অভিনীত হল 'বড়ো পিসীমা', 'শনিবার', 'সলিউশন এক্স', জে.বি.প্রিস্টলীর 'অ্যান ইনস্পেক্টর কলস্' এর কাহিনি অবলম্বনে 'থানা থেকে আসছি' নাটক। এই নাট্যোৎসবের সৌজন্যে দর্শক মহলে বাদল সরকারের 'চক্র'র মোটামুটি একটা পরিচিতি হয়। সেই সুবাদে বাদল সরকার ও তাঁর গ্রুপ 'চক্র'র এবার কলকাতার বাইরেও আমন্ত্রিত নাট্যাভিনয়ের সুযোগ আসে। প্রথম আমন্ত্রিত অভিনয় — এ সীতারামপুরে, সেখানকার রেলকর্মীদের আহ্বানে। এরপর পুরোনো কর্মস্থল 'মাইথনে'। ১০ই মার্চ ১৯৬২ সেখানে অভিনীত হল বাদল সরকারের 'সলিউশন এক্স'। সেখান থেকে ফিরে এসে কলকাতার রঙমহল, মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করলেন 'রাম শ্যাম যদু' নাটক। ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে আবার এ.টি.বি.এ-এর হল ঘরে অভিনীত হল বাদল সরকারের নাটক 'সমাবৃত্ত'।

এই পর্বে এভাবেই বাদল সরকারের থিয়েটার চর্চা চলতে থাকে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, নাটক লেখার ও প্রযোজনা সত্ত্বেও এই আদি পর্বে থিয়েটার তাঁর কাছে তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। তখনও পর্যন্ত থিয়েটার তাঁর কাছে শখ-শৌখিনতার আয়েসী বিলাসের বেশি কিছু নয়। নিজে কোন পেশাদারী থিয়েটারের দল তৈরি করে থিয়েটার করার ভাবনা তখনও পর্যন্ত বাদল সরকারের মাথায় ছিল না। তিনি জানিয়েছেন, ''থিয়েটার করছি, কিন্তু তাকে প্রোডিউস করার কথা মনে হয়নি। ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবকে শোনাচ্ছি, এই পর্যন্ত।''[১৩]

কখনো ক্লাব বা কখনো অস্থায়ী ভাবে নাটকের দল গঠন করে বাংলা নাট্যজগতে এভাবেই একটু একটু করে বাদল সরকারের একটা পরিচিতি তৈরি হতে থাকে। এরই মধ্যে ১৯৬৫-তে 'বহুরূপী' নাট্যপত্রে প্রকাশিত হল তাঁর 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটক। প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনেক নাট্যদল নাটকটি মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ নেয়। প্রথম করে শৌভনিক। ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫, তারা 'এবং ইন্দ্রজিৎ' মুক্তাঙ্গন মঞ্চে প্রথম অভিনয় করেন। নির্দেশনায় ছিলেন গোবিন্দ গাঙ্গুলি। এই অভিনয় এতটাই জনপ্রিয় হয় যে হঠাৎ করেই বাদল সরকারকে বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যজগতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> ''শৌভনিকে-র এবং ইন্দ্রজিৎ আমাদের অনেকেরই ভালো না লাগলেও তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় নাট্যজগতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলকাতায় অনামিকা কলা সংগম-এর আমন্ত্রণে এসে গিরিশ কারনাড, মোহন রাকেশ, বিজয় তেন্ডুলকর ও অরবিন্দ দেশপাণ্ডে মুক্তঅঙ্গন মঞ্চে নাটকটি দেখেই আকৃষ্ট হন। কারনাড পরে বলেছেন: প্রযোজনাটি আমার বেশ ভালোই লেগেছিল, যদিও মনে হয়েছিল ওরা একটু বাড়াবাড়ি করেছিল— অভিনয়েও বাড়াবাড়ি। বি ভি

কারন্থ কলকাতায় ওই প্রযোজনা দেখেই সত্যদেব দুবে-কে নাটকটির কথা বলেন। ... হিন্দিতে, গুজরাটিতে, ইংরেজিতে, মারাঠিতে কন্নড়ে, এবং ইন্দ্রজিৎ অভিনীত হচ্ছে, পরিচালনা করছেন গিরিশ কারনাড, সত্যদেব দুবে, মোহন মহর্ষি, অরবিন্দ দেশপাণ্ডে, বি. ভি কারন্থ রাজিন্দর নাথ, শ্যামানন্দ জালান।"[১৪]

বহুরূপী-তে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের প্রকাশ এবং পরবর্তীকালে নাট্যজগতে বাদল সরকারকে নিয়ে চর্চার সূত্রেই ইতোমধ্যে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। বহুরূপী দলের সঙ্গে তাঁর তখন যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা। বাদল সরকার লিখেছেন, ''বহুরূপী-র রিহার্স্যাল রুমে প্রায়ই আমাকে নাটক পাঠ করতে যেতে হোতো ... 'বাকি ইতিহাস', 'সারারাত্তির', 'বাঘ', 'রাম শ্যাম যদু' লেখাপড়া করে অনুমতি নিয়ে নিলো ওরা।"[১৫] এতদিন বাদল সরকার তাঁর নিজের মতন করে বিচ্ছিন্নভাবে থিয়েটার চর্চা করছেন ঠিকই কিন্তু সেই অর্থে প্রতিষ্ঠিত কোন গ্রুপ থিয়েটারে কাজ করার কোন সুযোগ হয়নি। এই প্রথম শম্ভু মিত্রের বহুরূপী নাট্যদলের মতো একটি গ্রুপ থিয়েটার দলের সঙ্গে বাদল সরকারের সংযোগ ঘটলো। বহুরূপীকে কেন্দ্র করে এবার শুরু হলো বাদল সরকারের থিয়েটার চর্চা। বাদল সরকার মনে মনে এরকমটাই চেয়েছিলেন। তিনি এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে চক্র বা ওই জাতীয় কোন অস্থায়ী গ্রুপ দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি থিয়েটার চর্চা সম্ভব নয়। তাঁর পক্ষে এককভাবে নাট্যদল তৈরি করাও তখন প্রায় অসম্ভব ছিল। তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি নাট্যদল যাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি তাঁর থিয়েটারকর্মকে একটা শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে পারেন। তাঁর এই জাতীয় চিন্তাভাবনার সাক্ষ্য পাওয়া যায় প্রতিভা অগ্রবালকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে—

''... বুঝতে পারছি যে চক্র দিয়ে আর হবে না, এবার একটা থিয়েটার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আবার হেজিটেট-ও করছি। আমি ওই ডিসিপ্লিন-এ খুব একটা আকৃষ্ট হতাম না। তার চেয়ে যদি একটা দল পেয়ে যাই, যাদের হয়তো অভিনয়ের বহুদিনের অভিজ্ঞতা আছে, অথচ ভালো নাটকের ব্যাপারে অভাব আছে, সেরকম কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেটাকে স্ট্রং করা বরং বেটার।"[১৬]

সেই ভাবনা থেকেই বাদল সরকার 'বহুরূপী'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। কারণ তখন বাদল সরকারের মনে হয়েছিল শম্ভু মিত্রের কাছে অভিনয় আর নির্দেশনার অনেক কিছু শেখবার আছে। অর্থাৎ তিনি এরকম একটি থিয়েটার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার কথা ভেবেছেন। আর তাই যখন বহুরূপী থেকে তাঁরই লেখা নাটক 'প্রলাপ'-এর পরিচালনার প্রস্তাব এলো তখন তিনি সেটা সাদরে গ্রহণ করলেন। সময়টা ১৯৬৭-র শেষের দিক। শম্ভু মিত্র তখন ফিলিপন্স, জাপান, আমেরিকা ও জার্মান

ভ্রমণরত। তাঁর অনুপস্থিতিতে ১৯৬৭-র ৩ অক্টোবর, বাদল সরকারের নির্দেশনায় নিউ এম্পায়ার মঞ্চে অভিনীত হলো 'প্রলাপ' নাটক। বহুরূপীর নাট্যপ্রযোজনার ইতিহাসে এটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। এই প্রথম শম্ভু মিত্রের পরিবর্তে তাঁরই নাট্যদলে নির্দেশনার কাজ করলেন বাদল সরকার। অভিনয় করেছিলেন কুমার রায়, কালীপ্রসাদ ঘোষ, দেবতোষ ঘোষ এবং বহু স্মরণীয় চরিত্রের সমর্থ অভিনেত্রী রমলা রায়। যেকোনো কারণেই হোক, দর্শক আনুকূল্য 'প্রলাপ' পায়নি। কিন্তু 'নাউ'-এর মতো মননশীল পত্রিকার ভালো লেগেছিল বাদল সরকারের নাটক এবং নির্দেশনা। তারা লিখেছেনে—

> "The naturalist menner of plywriting in Bengali has seldom attained greater heights than has in *pralap*. The production is distinctly different from previous Bohurupee plays in its manner as well as temper. Rightly so, because this time the illustrious Sambhu Mitra has made room for a new director, Badal Sarkar. And, in all fairness, it has to be granted that Mr Sarkar does not find the robes of the veteran loosely, hanging on this person. Relying entirely on simple productional methods he achieves as sort of definite slickness in the performance. The choreography is neat and tidy; the stage is spaciously propped with the barest necessaries; the lighting, costume and make-up of the players are controlled with the utmost tidiness."[১৭]

বহুরূপীতে ওই একবারই বাদল সরকার নির্দেশনার কাজ করেছেন। কারণ হিসেবে বাদল সরকার জানিয়েছেন— "... আমার টেম্পেরামেন্ট-এর সঙ্গে ওখানকার টেম্পেরামেন্ট মিলল না।"[১৮] তাই বহুরূপীর সঙ্গে বাদল সরকারের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হলো না। শম্ভু মিত্র নিজে বাদল সরকারের 'পাগলা ঘোড়া', 'বাকি ইতিহাস'-এর মতো নাটক প্রযোজনা করেছেন। কিন্তু নানা কারণে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে বাদল সরকারের সম্পর্কের অবনতি হয়। সম্পর্কের তিক্ততা বাড়ে 'বাকি ইতিহাস' নাটকের প্রোডাকশন নিয়ে। বাদল সরকারের পরিচালনায় 'প্রলাপ' নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পূর্বেই ৭ই মে ১৯৬৭, নিউ এম্পায়ার-এ শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় 'বাকি ইতিহাস' নাটক মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু সেই প্রযোজনা বাদল সরকারের পছন্দ হয়নি। কারণ শম্ভু মিত্রের ইচ্ছে মতো 'বাকি ইতিহাস' নাটকের বেশ কিছু অংশ অদলবদল করে মঞ্চস্থ করেছিলেন। যেমন 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি শম্ভু মিত্র

সংযোজন করেছিলেন যা বাদল সরকার পছন্দ করেননি। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''ওটা কি ওর মধ্যে ছিল? ... আমার বেসিক আপত্তি কিন্তু ওইখানে। আমি খোলাখুলি বলেছি শম্ভুদাকে, বহুরূপীর সবাইকেই বলেছি আমার কথা।''[১৯] বাদল সরকার তখনই বুঝেছেন বহুরূপীর সঙ্গে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অচিরেই বহুরূপীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে দিয়ে বাদল সরকার বেরিয়ে আসেন। আর সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন একটি প্রতিষ্ঠিত গ্রুপ থিয়েটারে নাট্য পরিচালনা করার এক বিরাট অভিজ্ঞতা।

এই পর্যন্ত এসে আমরা প্রসেনিয়াম থিয়েটারে বাদল সরকারের প্রস্তুতি পর্বের ইতি টানতে পারি। তার কারণ বহুরূপী নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া কিংবা তার পূর্ববর্তী কালের বিচ্ছিন্ন কিছু নাট্যকর্মের মধ্যেই বাদল সরকারের যাকে বলে থিয়েটার প্র্যাকটিস সেটি এই পর্বে করেছেন।

দ্বিতীয় পর্ব:

ইতিমধ্যে বাদল সরকার বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারে একটা পরিচিতি পেয়ে গেছেন। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের প্রচুর খ্যাতি এর একটা অন্যতম কারণ। শৌভনিক, বহুরূপী, অনামিকার মতো নাট্যদল বাদল সরকারের একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ করে বাদল সরকারকে যথেষ্ট খ্যাতি এনে দেয়। এই পর্বে এসে আমরা লক্ষ্য করি থিয়েটারের প্রতি তাঁর একটা দায়বদ্ধতার জায়গা তৈরি হতে থাকে। খ্যাতি তাঁকে আর শখের নাট্যকার থাকতে দেয় না। এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় হলো অন্যদলের তাঁর নাটকের বেশ কয়েকটি প্রযোজনা বাদল সরকারকে হতাশ করে। শৌভনিকের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' তাঁর ভালো লাগেনি। ''... সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা''[২০] বলে মন্তব্য করেছেন। শম্ভু মিত্র পরিচালিত বহুরূপী নাট্যদলের 'বাকি ইতিহাস' নিয়ে তাঁর সঙ্গে মনোমালিন্যের বিষয়টি আমরা তো আগেই বলেছি। নাটককারের কল্পনা ও নাট্যনির্দেশকের পাঠ ও প্রয়োগকল্পনার মধ্যে ব্যবধান যতই তাঁর কাছে প্রকট হয়ে উঠতে থাকে, ততই নিজের মতো করে নিজের লেখা নাটকগুলি প্রযোজনা করার বাসনা প্রবল হতে থাকে। আর সেই বাসনা থেকেই চক্র ভেঙে ১৯৬৭-র ২৯ আগস্ট বাদল সরকার তৈরি করলেন 'শতাব্দী' নাট্যদল। শতাব্দী-র রেজিস্ট্রেশন করলেন, নিজেই তার লোগো তৈরি করলেন, নিজেই ডিজাইন করলেন, তৈরি হল দল। এই নাট্যদলের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে বাদল সরকার বলেছেন:

> ''বহুরূপী বা নন্দীকার— এদের প্রথম দিকে একটা ঘোষণা ছিল না— ভালো নাটক ভালো করে করব, আমাদেরও খানিকটা সেই চিন্তা ছিল। তার সঙ্গে অ্যাডেড ফ্যাক্টর হচ্ছে, আমার লিখিত নাটকগুলো যা হাতের সামনে আছে—

যদিও কোনো লিখিত নিয়ম ছিল না যে আমার নাটকই করতে হবে। কিন্তু এটা হাতের কাছে আছে। ওই ধরনের নাটক করতে চাই, সেইজন্য *শতাব্দী* তৈরি হয়েছিল।"[২১]

বাদল সরকার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মধ্যে থেকেই তিনি তাঁর নাটকগুলির ভালোভাবে মঞ্চস্থ করার কথা ভেবেছিলেন। এর থেকে বেশি কিছু না। শতাব্দীর শুরুটা হয় একেবারে আর পাঁচটা গ্রুপ থিয়েটারের মতোই। খবরের কাগজে রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে শতাব্দী নাট্যদলের জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রী চাওয়া হতো। বাদল সরকার এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন,

"... পুরোপুরি প্রোফেশনল না হলেও খানিকটা ওই ধরনের অ্যাপ্রোচ, অর্থাৎ অ্যাকটর-দের কোঅপারেটিভ, যেখানে লাভ বলে কিছু থাকবে না, একটা অঙ্কের ওপরে বিক্রি হলেই সেটা খানিকটা শেয়ার করে নেওয়া হবে, অর্থাৎ একটা ইনসেন্‌টিভ্‌ থাকবে। ... আনন্দবাজার-এ একটা ক্ল্যাসিফায়েড ইনসারশন-ও দিয়েছিলাম।"[২২]

এভাবেই শতাব্দী-র যাত্রা শুধু হয়। শতাব্দী-র প্রথম নাটক 'কবিকাহিনী'। আর প্রথমেই আমন্ত্রিত অভিনয় ২৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮, ফারাক্কায়। মঞ্চ ব্যবস্থা সরল একটি সেটে চারটি দৃশ্যে কাহিনি বিস্তৃত। আবহসঙ্গীত অনুপস্থিত। আলোক সম্পাত যেটুকু একান্ত না হলে নয়। এখানে নাট্যকার জটিল সামাজিক সমস্যাকেও হাসির মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই নাটকে রাজনীতি, শ্লেষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ আছে, কিন্তু সবই যেন অনাবিল হাসির মখমলে ঢাকা। ১৭ই মার্চ ১৯৬৮-র আনন্দবাজার পত্রিকায় এই নাটকে বাদল সরকারের নাট্যপ্রযোজনার কথা মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা হয়—

"ব্যক্তিগত বা দলগত খোঁচাকে একটু চোখা করলেই একটু খেলো হলেই আরো দেদার হাততালি জুটত কিন্তু নাট্যকার কোন সহজিয়া সুরের প্রলোভনে পড়েননি। তারের ওপর দিয়ে হেঁটে গেছেন।"[২৩]

এই নাটকটির অভিনয় সম্পর্কে ১৯৬৮-র ১৪ মার্চ কালান্তর পত্রিকায় লেখা হয়—

"'শতাব্দী' সংস্থা প্রথম আবির্ভাবই যে অপূর্ব দলগত অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। বাদল সরকার যে একজন শক্তিমান অভিনেতাও— এ নাটকে তার পরিচয় পাওয়া গেল।"[২৪]

এ নাটকে অভিনয় করেছেন বিজয়া সরকার, পুতুল সরকার, শোভন চট্টোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ মুন্সী প্রমুখ। এরপর রবীন্দ্র সরোবরের সি আই টি-র ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানেই

শুরু হয় নিয়মিত অভিনয়। তখন শতাব্দী প্রতি রবিবার দু'টি করে শো করতো। 'কবিকাহিনী'-র পরপর বেশ কয়েকটি শো করা হয় এখানে। 'কবিকাহিনী'-র পর ঐ একই মঞ্চে শতাব্দী নামায় 'বাঘ' (১৯৬৮-র ৯ জুন) এবং 'বিচিত্রানুষ্ঠান' নাটক।

একটা প্রবল উৎসাহের সঙ্গে শতাব্দীর প্রোডাকশন শুরু হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেই উৎসাহে ভাটা পড়ে। শখ-শৌখিনতা থেকে থিয়েটার করা, আর এভাবে গ্রুপ থিয়েটার তৈরি করে থিয়েটার করা যে এক জিনিস নয়, এবার বাদল সরকার সেটা উপলব্ধি করতে পারলেন। মনে রাখতে হবে 'এনাকা' কিংবা 'চক্র' কোন থিয়েটারের দল নয়। ফলে সেই অর্থে এই ধরনের গ্রুপ থিয়েটার করার অভিজ্ঞতা বাদল সরকারের পূর্বে কখনো হয়নি। খুব সীমিত সময়ের জন্য বহুরূপী-তে কাজ করেছেন বটে কিন্তু এইভাবে একটি থিয়েটার গ্রুপ তৈরি করে নাট্যচর্চা করা এই প্রথম। ফলে শুরুতে তাঁকে কিছু কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমত: অর্থ। এই ধরনের থিয়েটারে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। মঞ্চের সাজসজ্জা, আলো, আসবাবপত্র, অভিনেতাদের পোশাক আর মেকাপ, সর্বোপরি হল ঘরের ভাড়া-এসবের খরচ তুলতে গিয়ে বাদল সরকারের তখন হিমশিম অবস্থা। স্বীকার করতে বাধা নেই নাট্য প্রযোজনায় বহুরূপী, নান্দীকার তখন যে মান তৈরি করেছেন, কি সার্বিক শিল্পগুণে, কি অভিনয়ে, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া নবগঠিত শতাব্দী-র পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে দর্শকসমাদর থেকে শতাব্দী তখনও বহু দূরে। লাভ তো দূর অস্ত, নিজের গচ্ছিত অর্থও একসময় ফুরিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার নিজেই জানিয়েছেন,

> ''তিনটের শো-গুলোতে প্রচণ্ডভাবে মার খায়, সন্ধ্যের শো-তে খানিকটা সাড়া পাই। *কবিকাহিনী* বোধ হয় আমরা ষোলোটা রবিবারের জন্য নিয়েছিলাম, পরে চারটে রবিবার আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ... পরের চারটে রবিবার *বাঘ* ও *বিচিত্রানুষ্ঠান* ডবল বিল হয়। তারপর ওটা বন্ধ করে দিই।''[২৫]

'বাঘ', 'বিচিত্রানুষ্ঠান' বন্ধ করে দেওয়ার পরেও বাদল সরকার শতাব্দী-কে নানা রকমভাবে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন। *'ত্রিংশ শতাব্দী'* নাটকের রিহারসালও দিলেন কিছুদিন। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। একদিকে আর্থিক ক্ষতি, অন্যদিকে দলের সদস্যদের মধ্যেই তৈরি হলো নানারকম মতানৈক্য। বাদল সরকার নিজেও তখনো পর্যন্ত দল পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজস্ব কোন দর্শন গড়ে তুলতে পারেননি। যেভাবে তিনি শতাব্দী শুরু করেছিলেন, সেটা সম্বন্ধে তাঁর নিজেরও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এইসব নানা কারণে প্রথম শতাব্দী এক বছরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। শতাব্দীর সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই অন্য নাট্যদলে চলে গেলেন। কেন তিনি সেই সময় শতাব্দী-কে টিকিয়ে রাখতে পারলেন না, তার কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান—

> ''...ফিলসফি পরিষ্কার না থাকা; যেভাবে আমি আরম্ভ করেছি, সেটা সম্বন্ধে আমার নিজেরও অসুবিধে; মনে হচ্ছে এটা করতে চাই না। এটা মনে হতে আরম্ভ করলে আমি থিয়েটার করা ছেড়ে দিলাম। শতাব্দী ডিস্‌ব্যানডেড হল। তখনকার চুক্তি মতো যেটুকু টাকা ছিল— সামান্যই টাকা - তা ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়ে, সিক্সটি এইট-এ, ... শতাব্দী উঠে গেল।''[২৬]

শতাব্দী-র এইভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাদল সরকারও যেন খানিকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন এবং তখন সিদ্ধান্ত নেন যে আর কোনদিন থিয়েটার করবেন না। কারণ বাদল সরকারের মনে হয়েছে তাঁর পক্ষে এই ধরনের থিয়েটার করা সম্ভব নয়। কিন্তু থিয়েটার তাঁর পিছু ছাড়ে না। শতাব্দী-র কয়েকজন সদস্য— ''দেবেন (গঙ্গোপাধ্যায়) একজন, পঙ্কজ মুনশি আরেকজন— এরকম কয়েকজন''[২৭]-এর উৎসাহে বাদল সরকার থিয়েটার নিয়ে আবার ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন। ১৯৬৯ সালে আবার নতুন করে শতাব্দী শুরু করলেন। প্রথমেই নাটক অভিনয়ে না গিয়ে সপ্তাহে একদিন করে অনেকটা স্টাডি সার্কেলের মতো নাটক পাঠের পাশাপাশি থিয়েটার নিয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবার বাদল সরকার আগের থেকে অনেক বেশি পরিণত। ইতিমধ্যে ১৯৬৯ সালে তিনি ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের অঙ্গরূপে ঘুরে এসেছেন রাশিয়া পোল্যাণ্ড আর চেকোস্লোভাকিয়া। সেখানে তিনি দেখেছেন কিভাবে কম খরচে থিয়েটার করা হয়। তাই দেশে ফিরে এসে যখন দ্বিতীয়বার শতাব্দী শুরু করলেন তখন প্রথমেই এই বিষয়টি নিয়ে নানা রকম চিন্তা করলেন। কারণ প্রথম শতাব্দী-র এক বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ার একটা অন্যতম কারণ হল অর্থ। এই ধরনের থিয়েটার করতে যে ধরনের অর্থের প্রয়োজন হয় বাদল সরকার তখন তা যেকোনো কারণেই হোক পেরে উঠছিলেন না। এবার যখন নতুন করে শতাব্দী শুরু করলেন তখন প্রথম অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন এই ধরনের থিয়েটারে খরচ কমাতে না পারলে শুধু টিকিট বিক্রির উপর নির্ভর করে থিয়েটার করা সম্ভব নয়। তাই প্রথমেই যথাসম্ভব খরচ কমানোর দিকে নজর দিলেন। প্রথমত: অল্প টাকায়, ছোটো হল ঘর ভাড়া নিয়ে প্রোডাকশন করাটাই তিনি শ্রেয় মনে করলেন। শুধু তাই নয়, মঞ্চের ব্যবস্থাপনার জন্য যে যে ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় সেই সবক্ষেত্রে খরচ কমানোর চেষ্টা করলেন, তিনি লিখেছেন—

> ''আমরা ক্রমেই মঞ্চসজ্জা, আলো, সাজপোশাক ও আবহসংগীত কমাতে লাগলাম। আমরা সিদ্ধান্ত করলাম, আমরা টেপ রেকর্ডার বা প্রোজেক্টর-এর মতো কোনো যান্ত্রিক উপকরণ ব্যবহার করব না।''[২৮]

বাদল সরকারের দীর্ঘদিনের সহকর্মী, শতাব্দী-র পুরোনো সদস্য পঙ্কজ মুন্সী সেদিনের স্মৃতিচারণ

করতে গিয়ে বলেছেন—

> ''... লোকসান কমাবার জন্য বাদলদা তখন বলতেন 'আমাদের hit & run policy-তে Production করতে হবে। তার কারণ নাটক শুরুর দিকে অনেক টাকা Push করে খানিকটা লোকসান কমানো যায়'।''[২৯]

প্রসেনিয়াম থিয়েটার অপরিহার্য কিছু উপকরণের জন্যই খরচ বেশি হয়। ফলে তিনি যখন এইসব উপকরণ বাদ দিলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই থিয়েটার করার আর্থিক চাপ থেকে তিনি খানিকটা মুক্ত হলেন। স্বল্প আয়োজনে, শুরু হলো নতুন দ্বিতীয় পর্বের শতাব্দী-কে কেন্দ্র করে তাঁর থিয়েটার চর্চা। শতাব্দী তখন একেবারেই চার-পাঁচ জনের একটা ছোট গ্রুপ। দ্বিতীয় পর্বের শতাব্দী শুরু হলো 'প্রলাপ' নাটক দিয়ে। নাটকের প্রস্তুতি নেওয়া হয় মাইথন-এর রিহার্সাল ক্লাবের পদ্ধতি প্রয়োগ করে। অর্থাৎ শুধু রিহার্সাল হবে, শো হবে না, এই পদ্ধতিতে নাটক তৈরি করা হয়। পরে 'প্রলাপ'-এর অভিনয় হয় রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ ভাড়া নিয়ে। এখানে 'প্রলাপ'-র দুটি শো হয়। এরপর 'প্রলাপ'র অভিনয় হয় প্রতাপ মেমোরিয়াল হল-এ, নাট্যকার নির্দেশক বাদল সরকার। অভিনয়ে ছিলেন বাদল সরকার, পঙ্কজ মুন্সী, দেবেন গাঙ্গুলী, বিজয়া সরকার, বিশ্বেন্দু দাস। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের শতাব্দীর প্রথম প্রচেষ্টায় তেমন সাড়া পেলেন না। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, ''অল্প ভাড়ায় ছোটো হল নিয়ে *প্রলাপ* করেছি। ন্যাচারালি খুব একটা সাড়া পাইনি।''[৩০]

'প্রলাপ'-এ সফল না হলেও বাদল সরকার হাল ছাড়লেন না। 'প্রলাপ'-র পর শুরু হলো 'শেষ নেই' নাটকের রিহার্সাল। এ নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে। পরে রবীন্দ্র সরোবর-এ। এই সময় শতাব্দীর আবার নিয়মিত অভিনয় আরম্ভ হয়। ধীরে ধীরে শতাব্দী সদস্য সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এই পর্বে তিনি নাট্যপ্রযোজনা ক্ষেত্রে অনেক বেশি হিসেবি। প্রথম শতাব্দীর সময় তিনি নাট্য প্রযোজনায় যেভাবে সামর্থের অধিক পাবলিসিটির উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবার কিন্তু তিনি সেটা করলেন না। কারণ তাতেও অনেক খরচ বাঁচানো যায়। বাদল সরকারের তখন ঘোষিত নীতি হল,

> ''...লোকসান খেলেও আমি কারও কাছে টাকা নেবও না, কাউকে কিছু টাকা দেবও না। মানে, দর্শকের উপরেই যদি চলে, তবে ওই প্রিন্সিপল-টা ডিভেলপ করে একটা নতুন প্রোডাকশন-এ সেট, কসটিউম আর প্রপ্‌স্, তিনটে মিলিয়ে একশো টাকার মধ্যে খরচ রাখব।''[৩১]

এই সময় প্ল্যাটফর্মকে বাড়িয়ে কমিয়ে, একটা নাটকের সেট-এর মালপত্র পরের নাটকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করতে লাগলেন। কারণ একটাই; আর্থিক খরচ কমিয়ে লোকশান থেকে

শতাব্দীকে বাঁচানো। এই একই পন্থায় করা হয় 'বল্লভপুরের রূপকথা'। প্রথম অভিনয় হয় ২৮শে নভেম্বর ১৯৭০, প্রতাপ মেমোরিয়াল হল-এ। তারপর অভিনয় হয় রবীন্দ্র সরোবরে। 'বল্লভপুরের রূপকথা'র টোটাল সেট খরচ পড়েছিল ৬৫ টাকা।'[৩২] ওই সামান্য টাকা খরচ করেই 'বল্লভপুরের রূপকথা'-র সেট বানিয়েছিলেন। ভগ্নপ্রায় রাজপ্রাসাদের রাজসভার সিংহাসন থেকে শুরু করে অট্টালিকার থাম-সবই ওই টাকাতেই করেছেন।

কিন্তু তখনও পর্যন্ত শতাব্দী একটি গ্রুপ থিয়েটারের দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে বহুদূরে। বাদল সরকার যখন 'বল্লভপুরের রূপকথা'র প্রোডাকশন করেন তখন শতাব্দীর 'ফিনান্সিয়াল অবস্থা কাহিল'।[৩৩] দ্বিতীয়বার শতাব্দী প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। বাদল সরকার জানিয়েছেন,

> ''... রবীন্দ্র সরোবরের শো-তে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এক তৃতীয়াংশ কি এক চতুর্থাংশ যদি ভর্তি না হয় তা হলে শতাব্দীর এখানেই ইতি। আর থিয়েটার করব না। তার ফলে শতাব্দীর সমস্ত মেম্বার এমনকি আমিও সবাইয়ের কাছে গিয়ে বলতে লাগলাম— তোমরা এবার যদি টিকিট না কাটো আমরা কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছি।''[৩৪]

সেদিন দর্শক সাধারণ বাদল সরকারকে নিরাশ করেননি। জনপ্রিয় হয়ে উঠলো এই নাটক। তিনি জানিয়েছেন, ''সেই প্রথম রবীন্দ্র সরোবরে আমাদের প্রযোজনা 'হাউস ফুল' হয়, এমনকি কিছু লোক ফিরেও যায়।''[৩৫] এক কথায় এই প্রথম বাদল সরকার একটি স্বাধীন গ্রুপ থিয়েটারের দল তৈরি করে সাফল্যের মুখ দেখলেন।

'বল্লভপুরের রূপকথা'-র পর শুরু হলো গৌরকিশোর ঘোষের গল্প 'সাগিনা মাহাতো' অবলম্বনে লেখা নাটক 'সাগিনা মাহাতো'। ৮ই আগস্ট, ১৯৭১-এ প্রতাপ মেমোরিয়াল হল-এ অভিনীত হলো 'সাগিনা মাহাতো'। অভিনয়ে ছিলেন দেবেন গাঙ্গুলী, আদিত্য মিশ্র, দিলীপ ভট্টাচার্য, পঙ্কজ মুন্সী, মুরারী চক্রবর্তী, ভারতী সরকার, অপূর্ব বসু, বাদল সরকার। আলোক সম্পাতে ছিলেন তপন দাস। আমরা জানি এই একই নামে পরিচালক তপন সিংহের সিনেমাটি তখন মুক্তি পেয়ে গিয়েছে এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়ও হয়েছে। এতদসত্ত্বেও বাদল সরকার সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবনা এবং নাট্যবোধের মিশেল ঘটিয়ে অসাধারণ এক নাট্য নির্মাণ করলেন। পঙ্কজ মুন্সী লিখেছেন—

> ''এ নাটকে মঞ্চের প্রতিটি অংশকে উনি ব্যবহার করেছিলেন। সামান্য কয়েকটি কাঠের বিভিন্ন আকারের বাক্স দিয়ে দৃশ্য বিভাজন করেছিলেন। যা সে সময়ে অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপই ছিল। অবশ্য তিনি কখনোই দৃশ্যসজ্জার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। বলতেন— আমাদের মতো গরিব দেশে মঞ্চের জন্য

অতিরিক্ত খরচ করা বাহুল্য।''[৩৬]

'বল্লভপুরের রূপকথা'র পর শতাব্দীর এটি দ্বিতীয় মঞ্চসফল প্রযোজনা।

'সাগিনা মাহাতো'-র পর করলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'আবু হোসেন'। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঘোষকে হুবহু অনুসরণ না করে নাটকের বেশ কিছু অংশ তিনি নিজের মতো করে পুনর্নির্মাণ করে নেন। এই নির্মাণকে বাদল সরকার বলেছেন 'বিকৃতি'। তিনি জানিয়েছেন ''আমাদের প্রযোজনার ঘোষণার যেমন 'রচনা গিরিশ ঘোষ/বিকৃতি : বাদল সরকার' বলা হত...।''[৩৭] এবারও তিনি পুরোপুরি সফল। এখানেও ঐতিহাসিক নাটকে অনারম্বরমঞ্চ ও পোশাক ব্যবহার করে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বাদল সরকার লিখেছেন,

> '' 'আবু হোসেন'-এ রাজসভা, বাগান, বৈঠকখানা ও রাস্তার সেট ছিল, আর এই সবকিছুর জন্যে আমাদের খরচ হয়েছিল একশ টাকারও কম। আসলে, আমরা আমাদের ও দর্শকদের কল্পনাশক্তিকে ব্যবহার করতে শিখেছিলাম।''[৩৮]

এইভাবেই শতাব্দী গ্রুপ থিয়েটারের জগতে একটা নিজস্ব জায়গা করে নেয়। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন,

> ''*বল্লভপুরের রূপকথা*-র পিঠোপিঠি *সাগিনা মাহাতো* আর *আবু হোসেন*, গ্রুপ থিয়েটারে আমাদের প্রথম সাক্সেস, অর্থাৎ কলকাতার শো-তেই কলকাতার কাস্টিং-টা উঠে আসছে, তা থেকেই হল ভাড়া, স্পটলাইট, সব-কিছুর কস্ট উঠে আসছে, এটা সাকসেস-এর লক্ষণ, কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারে। সেই অবস্থায় আমরা পৌঁছে যাই।''[৩৯]

অনেকের মতে এই পর্বে বাদল সরকার মূলত একজন নাটককার, থিয়েটারকর্মী হয়ে উঠতে তিনি তখনও পারেননি। এটা ঠিক যে প্রসেনিয়াম পর্বের প্রথমার্ধে বাদল সরকার বাঙলার থিয়েটার প্রেমীর সামনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্মের দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারেন নি। অথচ সমকালের বহু নাট্যগোষ্ঠী প্রসেনিয়াম মঞ্চ থিয়েটারের প্রকৃতি নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। বহুরূপী, এল টি জি, নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ এবং আরো অনেক নাট্যদল গুণমানের দিক থেকে তখন অনেক এগিয়ে। তবে সেসময় বাদল সরকার একটার পর একটা নাটক লিখে বাংলাসহ ভারতীয় নাট্যজগতে নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের সুখ্যাতি সর্বজন বিদিত। এই নাটকের জন্য ১৯৬৮ সালে ভারত সরকারের সংগীত নাটক একাডেমি পুরস্কার পান বাদল সরকার। আমাদের মনে হয় এই সব কারণেই বাদল সরকারের থিয়েটার জীবনের এই পর্বের আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে তাঁকে নাটককার হিসেবেই দেখতেই বেশি স্বচ্ছন্দবোধ

করেন। প্রতিভা অগ্রবাল লিখেছেন,

> ''লোকেরা বলেন, যাদের মধ্যে আমরাও সামিল, বাদলবাবু যাই বলুন না কেন, নাটককার হিসাবে উনি মূলত প্রসেনিয়াম মঞ্চের নাটককার।"[৪০]

অর্থাৎ তিনি বাদল সরকারকে যখন একজন নাটককার হিসেবে বিচার করছেন তখন তিনি তাঁর এই প্রসেনিয়াম পর্বকেই বেছে নিয়েছেন।

বিশাখা রায়, যিনি বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের অন্যতম সহযোদ্ধা, তিনি তো বাদল সরকারের এই পর্বের থিয়েটার চর্চাকে গুরুত্ব দিতেই চান না। তাঁর বক্তব্য—

> ''... ভোমা জাতীয় নাট্যসৃষ্টির পর্ব পর্যন্ত থিয়েটারকর্মী হিসাবে ওঁর কর্মধারা খুবই সীমিত ছিল। দীর্ঘ থিয়েটার জীবনে নাটক করাটা প্রধানত ব্যক্তিগত শখ হিসাবেই দেখা হয়েছে।"[৪১]

কিন্তু এই ধরনের মূল্যায়নের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ সহমত হতে পারছি না। মাইথন থেকে চক্র পর্যন্ত বাদল সরকারের থিয়েটার চর্চা শৌখিনতার স্তরে থাকলেও শতাব্দী গঠনের পর থেকেই বাদল সরকার আর কেবল নাটককার নন। বস্তুত এই পর্ব থেকেই বাংলা থিয়েটারের জগতে একজন নিয়মিত অভিনেতা, নাট্যপরিচালক এবং নির্দেশক হিসেবে বাদল সরকার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের প্রচলিত মঞ্চব্যবস্থা মধ্যেই বাদল সরকার বেশকিছু ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব নাট্যভাবনার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রথমেই যে বিষয়টি আমাদের চোখে পড়ে তা হল এই পর্বে লিখিত তাঁর নাটকগুলির নাট্যআঙ্গিকের অভিনবত্ব। বাদল সরকার প্রথাগত নাটকের অঙ্ক, দৃশ্য বিভাজন বিষয়টি নিলেও পাঁচ অঙ্কের ধারণা থেকে সরে এসে তিনি তাঁর নাটকগুলি কখনো দুই অঙ্কে, কখনো তিন অঙ্কে আবার কখনো কোনো অঙ্ক, দৃশ্য বিভাজন না রেখে নাটক তৈরি করে নিয়েছেন। 'সলিউশন এক্স' একাঙ্কটি তিনি ভেঙেছিলেন চারটি দৃশ্য। 'শনিবার' নাটকে কোন অঙ্ক, দৃশ্য, বিভাজন নেই, 'এবং ইন্দ্রজিৎ' তিনটি অঙ্কে বিন্যস্ত। 'সারারাত্তির' নাটকের তিনটি দৃশ্য, 'বল্লভপুরের রূপকথা'র মোট দৃশ্যের সংখ্যা চার। বেশ কিছু নাটকে তিনি 'যবনিকা' দিয়ে নাটক শেষ করার প্রথাগত নাট্যরীতিটি ব্যবহার করেছেন। এটা অনেকটা নাটক শেষে দর্শকের সঙ্গে একটু ভাবের আদান-প্রদান করে নেওয়া। যেমন— 'বড়ো পিসীমা' নাটক। নাটকটি শেষ হচ্ছে যবনিকা দিয়ে—

'' **'যবনিকা':**

(যবনিকা পড়িবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিতাই বাহির হইয়া নমস্কার করিল)

নিতাই : ভীমাপুকুর ম্যান্‌শন্‌স্‌ নাট্যসংঘের উদ্যোগে অভিনীত 'কালবৈশাখী' এইখানেই শেষ হোলো। যাবার আগে আপনাদের কাছে দু'একটি কথা নিবেদন করতে চাই। আমাদের এই প্রথম প্রচেষ্টা। যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে আপনারা নিজগুণে মার্জনা করবেন। আপনারা হয় তো জানেন— একটা নাটক পরিকল্পনা থেকে মঞ্চ পর্যন্ত টেনে আনতে কত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। ... আপনারা সকলে আমাদের যে সাহায্য করেছেন— চাঁদা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, শেষ পর্যন্ত বসে থেকে, এবং— ইয়ে, হাততালি দিয়ে, তার জন্য আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(নিতাইয়ের কথা শেষ হইতে পর্দা সরিল। দেখা গেল মঞ্চে অর্ধচন্দ্রের আকারে দাঁড়াইয়া আছে যথাক্রমে স্মারক, ধ্রুবেশ, রাজীব, খোকা-খুকুকে লইয়া বৌদি, অনু, পিসীমা ... ইহাদের সমবেত অভিবাদনের পর বারান্দার দরজা দিয়া অনাথ ও জগৎ শম্ভুকে টানিয়া সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল, এবং অভিবাদন করিয়া জগৎ গেল স্মারকের পাশে, অনাথ অনন্তর পাশে। ইতিমধ্যে নিতাই পিছনে বৌদিদের পাশে গিয়ে দাঁড়াইয়াছে। শম্ভু পিছন দিকে পলায়নের চেষ্টা করিবামাত্র নিতাই তাহাকে ধরিয়া নিজের ও অনুর মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিল। অতঃপর সমবেত অভিবাদন ও যবনিকা।)''[৪২]

অর্থাৎ এখানে 'যবনিকা'টি নাট্যাংশের সঙ্গেই অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন।

লক্ষণীয় বিষয় এই পর্বে বাদল সরকার বাইরের দিক থেকে প্রথাগত নাট্য আঙ্গিক থেকে তিনি খুব একটা সরে আসেননি। প্রথাগত আঙ্গিককে তিনি ভাঙছেন নাটকের ভেতর থেকেই। 'এবং ইন্দ্রজিৎ'— নাটকে যেমন প্রায় দর্শকাসন থেকেই যেন নাট্যচরিত্রদের ডেকে নিচ্ছেন মঞ্চে।

''লেখক।। কী লিখবো? কাকে নিয়ে লিখবো? ...

মানসী।। (দর্শকদের দেখিয়ে) এই এতো লোক আছে— এদের একজনকেও চেনো না? একজনেরও কথাও জানো না?

....

লেখক।। অনেক চেষ্টা করেছি।

[কাগজের কুচিগুলি ছুঁড়ে ফেলে লেখক ফিরে গেলো টেবিলে। মানসী অল্পক্ষণ

দাঁড়িয়ে চলে গেলো। হঠাৎ লেখক ফিরে দাঁড়ালো। এগিয়ে এলো সামনের দিকে। প্রেক্ষাগৃহে ঠিক তখনই দেরি করে আসা চারজন দর্শক আসন খুঁজছে। লেখক তাদের উদ্দেশ্য করে হাঁক ছাড়লো।]

শুনুন! এই যে শুনছেন?

[দর্শকরা শুনলেও তাদের উদ্দেশ্যে হাঁক ধারণা করতে পারেনি প্রথমে]

শুনছেন— ও মশাই?"[৪৩]

অবশ্য এই ধরনের নাট্যকৌশলের ব্যবহার একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ। তাঁর কারণ এই ধরনের নাট্যকৌশল আর কোন নাট্যে, অন্তত এই পর্বে তিনি ব্যবহার করেননি।

বাদল সরকারের প্রসেনিয়ম থিয়েটার পর্বের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো আলো ব্যবহারে তাঁর অপূর্ব মুন্সিয়ানা। মঞ্চে আলো-অন্ধকারের পরিবর্তনকে নাট্যচরিত্রের আত্ম-উন্মোচনের (চরিত্রের রূপান্তর) কৌশল হিসেবে ব্যবহার করতেন। 'বাকি ইতিহাস' নাটকে শরদিন্দু ও বাসন্তী থেকে বিজয়, কণা, সীতানাথে রূপান্তরিত করার জন্য মঞ্চে সুকৌশলে আলো-অন্ধকারের ব্যবহার করেছেন। কীভাবে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, টেক্সট থেকে তার একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারি—

"শরদিন্দু ।। ... এই বাসন্তী?

[বাসন্তীর সাড়া পাওয়া গেল না।]

শুনছো? বাসন্তী!

[তবু সাড়া নাই। শরদিন্দু ধীরে ধীরে ফিরে এলো টেবিলে। চিন্তিত। একটা বই তুললো। নামিয়ে রাখলো। একবার পায়চারি করলো। তারপর হঠাৎ বসে লিখতে শুরু করলো। আলো কমে এলো ক্রমে। অন্ধকারের আড়ালে শরদিন্দু মঞ্চ ছেড়ে গেলো। শূন্য মঞ্চ আলোকিত হলো আবার। কড়া নাড়ার শব্দ। কণা রান্নাঘর থেকে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে দরজা খুলে দিলো। বিজয়ের প্রবেশ।]"[৪৪]

আবার 'পাগলা ঘোড়া' নাটকে যেমন মঞ্চকে স্পষ্টত দুটি অংশে ভাঙছেন নাট্যকার— ঘর আর ঘরের বাইরে। আলো জ্বালিয়ে আর নিভিয়ে দুটো অংশকে নিয়ে এগোচ্ছে নাটক। নাটকের শুরুতে দেখা যায় ঘরের বাইরের অংশের পেছন দিকটা অন্ধকার। ঘরের ভেতরে তাস খেলছে সাতু, কার্তিক, শশী আর হিমাদ্রি। বাইরে চিতায় পুড়ছে মেয়েটি। চারজনের সংলাপে এগোতে থাকে—

"শশী।। মেয়েটা কে, কী বৃত্তান্ত-সেসব খবরও রাখেন না বোধ হয়?

...

সাতু।। ওই মেয়ে মানে? ওই মেয়ে কী?

[হঠাৎ অন্ধকার চিরে খিল খিল করে হেসে উঠলো মেয়েটা। ঘরের বাইরের অন্ধকার অংশটা জ্বলে উঠলো। খোলা চুল, কোমরে আঁচল জড়ানো। মেয়েটা হেসেই চলেছে। ঘরের আলোটা নিভে গিয়ে তিনজনকে ছায়ামূর্তি করে রেখেছে। তাদের দেহ স্থির, তারা হাসি শোনেনি কেউ।]

মেয়েটা ।। (হাসতে হাতে) আমি কী! আমি কে! কী বৃত্তান্ত! তোমরা জানো না? তোমরা জানো না কেউ? আমি কী? আমি কে? কী বৃত্তান্ত?

[আলো কমে অন্ধকার হয়ে গেলো আবার। মেয়েটার চেহারা, মেয়েটার হাসি মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে। ঘরে আবার আলো। কথাবার্তায় কোনো বিরতিই যেন পড়েনি।]"[৪৫]

এখানেই বাদল সরকারের নাট্যায়নের অভিনবত্ব। প্রচলিত প্রসেনিয়াম থিয়েটার মঞ্চকে এভাবেই তিনি ব্যবহার করেছেন।

একই চরিত্রের বারবার অন্য চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া এই পর্বের নাট্যআঙ্গিকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের মাসিমা আর ইন্দ্রজিতের মা কিংবা 'মানসী'-র একাধিক ভূমিকায় রূপান্তর। 'বাকি ইতিহাস' নাটকে শরদিন্দুর সীতানাথে, বাসন্তীর কণা-র ভূমিকায় রূপান্তর। আবার 'পাগলা ঘোড়া' নাটকের 'মেয়েটা' অনায়াসে 'মালতী', 'মিলি' কিংবা 'লছমি' হয়ে যায়—

ক) ''শশী।। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) মালতী!

[মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে মালতী হয়ে উঠে দাঁড়ালো। শশী এগিয়ে এলো তার দিকে।]

মালতী!"[৪৬]

খ) ''হিমাদ্রি ।। (যন্ত্রণায়) মিলি!

.....

[মেয়েটা মিলি হয়ে এগিয়ে এলো]"[৪৭]

গ) ''সাতু।। লছমি।

[মেয়েটা লছমি হয়ে দাঁড়ালো। সাতু ঘুরে এগিয়ে এলো তার কাছে।]"[৪৮]

চরিত্রের এই রূপান্তর কীভাবে দর্শকের সামনে তুলে ধরা হবে সে সম্পর্কে বাদল সরকারের একটা

নির্দিষ্ট অভিমত ছিল। শম্ভু মিত্র 'বাকি ইতিহাস' নাটকের প্রযোজনায় শরদিন্দু, সীতানাথ, বাসন্তী, কণার চরিত্রের রূপান্তর দু'জন অভিনেতাকে দিয়েই করিয়েছেন। শম্ভু মিত্রের মনে হয়েছিল নাটকের বয়ান অনুযায়ী এটাই একমাত্র পদ্ধতি। কিন্তু বাদল সরকার একই চরিত্র দিয়ে এইভাবে অভিনয় করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণটা বাদল সরকার নিজেই জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত তিনি 'বাকি ইতিহাস নাটকের' উল্লেখ করে বলেছেন—

> ''... আমি ওই একই অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়ে সীতানাথ-কণা, আর শরদিন্দু-বাসন্তী করার পক্ষপাতী নই, ...। ওটা যদি করা হয়, তাহলে থার্ড অ্যাক্ট-এ নতুন একজন অভিনেতাকে সীতানাথ সাজিয়ে আনতে হয়। যেটা ইমিডিয়েট্‌লি থিয়েট্রিকালি দর্শকদের ইমপ্রেশন দেবে যে এইটেই তাহলে রিয়াল কারণ। তা তো নয়, আসলে তো শরদিন্দু, তার চিন্তাটাই রিয়াল কারণ। ... কাজেই এক অভিনেতা অভিনেত্রী দিয়ে করানোটা আমি কোনো মতেই পছন্দ করি না।''[৪৯]

বাদল সরকার এই পর্বে যেহেতু প্রসেনিয়াম থিয়েটারের কথা মাথায় রেখে নাটক লিখেছেন সেজন্য প্রসেনিয়াম থিয়েটারের দাবি মেনে নাটকের চরিত্রগুলো কীভাবে অভিনয় করবে, কীভাবে নড়াচড়া করবে, কোথায় বসবে, কোথায় দাঁড়াবে সবকিছু আগের থেকেই নির্দিষ্ট করে দিতেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন—

> ''স্বভাববাদী থিয়েটার 'মুভমেন্টের' দিক থেকে ভয়ানক সীমাবদ্ধ। কারণ আধুনিক সভ্যতায় দৈনন্দিন জীবনের 'মুভমেন্ট' ভীষণ সীমাবদ্ধ, সেটাকে নকল করাই হচ্ছে স্বভাববাদী থিয়েটার। ... স্বভাববাদী থিয়েটারে কয়েকটি মাত্র বিকল্প মুভমেন্ট-এর বাইরে যাওয়া যায় না।''[৫০]

অভিনেতা-অভিনেত্রী এই সমস্ত মুভমেন্ট যাতে খুব সহজে রপ্ত করতে পারে, সেই জন্য বাদল সরকার এই পর্বে প্রোডাকশন নোট্‌স-এর ব্যবহার করতেন। বাঁ দিকের পাতা সাদা রেখে তাতে ডাউনস্টেজ লেফট, আপস্টেজ রাইট, ইত্যাদি ছোট ছোট ডায়াগ্রাম তৈরি করে রাখতেন। এর পাশাপাশি সেটের জন্য নানা রকম মডেলও আগের থেকে তৈরি করে রাখতেন। অভিনেতাদের প্রোডাকশন নিয়ে খুব একটা চিন্তা করতে হত না। কারণ সবকিছুই পরিচালক বাদল সরকার ভেবে রাখতেন। তিনি এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন,

> ''... সেই সময় অভিনেতারা খুব খুশি ছিল কারণ সবই তো পরিচালক ভেবে রেখে দিয়েছে ওদের জন্য, ওদের চিন্তা করার কোনো দরকার নেই, প্রথমে

অবশ্য একটু অস্বস্তি হচ্ছে, বারবার রিহারসাল থামাচ্ছি, না, এদিকে আসতে হবে, তবু শেষ পর্যন্ত যেহেতু এটা পরিচালকেরই নাটক, সুতরাং সকলেই খুব খুশি, কারণ ওদের চিন্তা করতে হচ্ছে না।"[৫১]

পরবর্তীকালে অবশ্য বাদল সরকার এই ভাবনা থেকে সরে আসেন। রিহার্সালের আগে পরিকল্পনা করার এই রীতি থেকে তিনি পুরোপুরি সরে আসেন। তিনি জানাচ্ছেন,

"... আমাদের থিয়েটারে যখন বিষয়বস্তুটাই প্রাধান্য পেতে শুরু করল, তখন প্রত্যেক অভিনেতার ওই বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত একাত্মতা আবশ্যিক হয়ে উঠল। এখন কিন্তু নির্দেশকের হুকুম মেনে, পুতুল হয়ে, কাজ করা আর সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত: একবার এই প্রক্রিয়ায় এসে পৌঁছোলে নির্দেশকের তো মহা সুবিধে। সব চিন্তা তাকে আর করতে হচ্ছে না। তাছাড়া একজনের চিন্তার সঙ্গে আর পাঁচজনের চিন্তা যুক্ত হলে সেটা সমৃদ্ধ হবে।"[৫২]

এভাবেই বাদল সরকারের নাট্যনির্মাণ প্রক্রিয়া ক্রমশ একটা পরিণতির দিকে এগিয়েছে।

বলাবাহুল্য বাদল সরকারের এই প্রসেনিয়াম থিয়েটার পর্বের জার্নিটা খুব একটা সুখের ছিল না। আর পাঁচটা থিয়েটার দলের মতোই শতাব্দীকে প্রতি মুহূর্তে টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছিল। থিয়েটার হল ভাড়া করা, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, পোস্টার, লিফলেট সেট ও জিনিসপত্র, পোশাক আলো-এই সব কিছুর খরচ বহন করে লড়াইয়ে টিকে থাকা শতাব্দীর মত একটি ছোট্ট দলের পক্ষে একটা সময় প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু সেখান থেকে ধীরে ধীরে বাদল সরকার শতাব্দীকে সেসময়ের কলকাতার যেকোনো গ্রুপ থিয়েটারের সমতুল্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কেমন ছিল সেদিনের সেই জার্নি? এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার জানিয়েছেন,

"আমাদের থিয়েটারের দল শতাব্দী-র জন্ম থেকে মোট সাতটা পূর্ণাঙ্গ ও দুটো ছোট নাটকের কাজ করলাম। ক্রমাগত প্রযোজনার খরচ কমানো, নাটক তৈরিতে কঠোর পরিশ্রম, বন্ধুদের টিকিট কেনার জন্য ঝুলোঝুলি করা— এই সবই-যতক্ষণ না পর্যন্ত সফল হলাম অর্থাৎ আমাদের শহরের অভিনয়গুলো নিজের পায়ে দাঁড়াল। শেষ তিনটি প্রযোজনার ক্ষেত্রেই এমনটা হল— 'সাগিনা মাহাতো', 'বল্লভপুরের রূপকথা' আর 'আবু হোসেন'— বিশেষত সেটির ক্ষেত্রে। তখন আমরা আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল; এমনকি আমাদের মূলধন চার অঙ্কের দাগ ছাড়িয়ে গেল!"[৫৩]

এই সময় প্রসেনিয়াম স্টেজে বাদল সরকার সফলভাবে একটার পর একটা প্রোডাকশন করে চলছেন।

নানা প্রান্ত থেকে 'কল শো'— আমন্ত্রিত অভিনয়ের ডাকও পাচ্ছেন। আর ঠিক তখনই দ্বিতীয়বার শতাব্দী নাট্যদল পুরোপুরি ভেঙে দিয়ে প্রসেনিয়াম থিয়েটার ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন বাদল সরকার। নেমে এলেন দর্শকের সমতলে— অঙ্গনমঞ্চে। তিনি এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

> "... আমরা যে-সময় প্রোসেনিয়ম ছেড়ে দিচ্ছি সে সময়টা কিন্তু *সাগিনা মাহাতো*, *বল্লভপুরের রূপকথা*, *আবু হোসেন*, বেশ রমরমায় চলছিল, প্রচুর কল 'শো' আসছিল, প্রযোজনাগুলি বেশ ভালো চলছিল। সেই সময়টাতেই আমরা অঙ্গনমঞ্চে নেমে আসি।"[৫৪]

মোটামুটি ১৯৭০ থেকে ১৯৭১-এই সময় পর্বের মধ্যে বাদল সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু মৌলিক পরিবর্তন আসতে শুরু করে। এই সময় থেকে প্রসেনিয়াম থিয়েটার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন বাদল সরকারের মনে দানা বাধে। হঠাৎ একদিন ঠিক করলেন যে নাটকগুলো তিনি প্রসেনিয়ামের বাধা মঞ্চে করছেন সেগুলি অন্যভাবে করা যায় কিনা। এই ভাবনা থেকেই এ.বি.টি.এ-এর হলঘর ভাড়া নিয়ে সেটিকেই অঙ্গন মঞ্চ বানিয়ে ২৪ অক্টোবর, ১৯৭১ অভিনয় করলেন 'সাগিনা মাহাতো'। কেমন ছিল সেই মঞ্চ পরিকল্পনা? নাট্যঅভিনেতা, শতাব্দী-র পুরনো নাট্যকর্মী পঙ্কজ মুন্সী স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছেন—

> "... 'সাগিনা মাহাতো'-র জন্য বাদলদা আসগুনলোকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দর্শকদের বসার জায়গা করে দিলেন এবং বেশ কিছু অংশ বার করলেন অভিনয় করার জন্য। আর মঞ্চটাকে অফিস এবং পার্টি অফিস হিসেবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করলেন। ফলে গোটা হলটা হয়ে উঠল কখনো কারখানার কক্ষ, কখনো ভাটিখানা, কখনো প্রকাশ্য মাঠ, কখনো বা সাগিনার ঘর। দর্শকের দৃষ্টি যখন যে অংশে অভিনয় হয়েছে সেইদিকে। শিল্পীরা বিভিন্ন দিক থেকে দর্শকদের মাঝখান দিয়েই যাতায়াত করছে। নাটক চলতে লাগল। হঠাৎ যে কোনো কারণেই হোক, আলো নিভে গেল। এদিকে নাটক তখন জমে উঠেছে। হঠাৎ দেখলাম, যাদের পকেটে দেশলাই ছিল 'ফস' করে তা জ্বলে উঠল। আমরাও অভিনয় চালিয়ে গেলাম। সামান্য সময় পরে আলো এসে গেল। সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম প্রসেনিয়ামে এই ঘটনা ঘটলে হয়তো বা সাময়িক নাটক বন্ধ রাখতে হত। শো-এর পরে একজন দর্শকও আলো নিভে যাওয়ার কথা বলেননি ... এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি আমাদের ভিন্নধারার থিয়েটারের দিকে ভাবনাচিন্তা করানোর চেষ্টা করেছিলেন।"[৫৫]

এই নতুন ফর্মে নাটক করার পর বাদল সরকার তখন ঠিক করলেন এই ধরনের মঞ্চেই এবার থেকে নাটক করবেন। কিন্তু 'সাগিনা মাহাতো'র সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই যে প্রসেনিয়াম মঞ্চের সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে অঙ্গনমঞ্চে নেমে এসেছেন এমনটা নয়। প্রথমদিকে বাদল সরকার ভেবেছিলেন প্রসেনিয়ামও কাজ করবেন এবং সাথে সাথে অঙ্গনমঞ্চেও করবেন। দেখা যায় ২৪ অক্টোবর, ১৯৭১ অঙ্গনমঞ্চে 'সাগিনা মাহাতো' করার পরও তিনি প্রসেনিয়াম মঞ্চেও নাটক করেছেন। এইসময় 'সাগিনা মাহাতো', 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'আবু হোসেন' ঘুরেফিরে অঙ্গন মঞ্চ-প্রসেনিয়াম মঞ্চে অভিনয় করছেন। ১৯৭২-র শেষের দিকেও এই দুই ধরনের মঞ্চে তাঁর নাট্যচর্চা চালিয়ে গেছেন। ৩০ শে অক্টোবর ১৯৭২ ইম্ফলে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটক প্রসেনিয়াম মঞ্চ অভিনীত হয়। আসলে সেই সময় শতাব্দীর বেশিরভাগ অভিনেতাই প্রসেনিয়াম ছাড়তে চাননি। শতাব্দী-র সদস্যদের কথা ভেবেই বাদল সরকারকে দুই ধরনের মঞ্চেই অভিনয় চালিয়ে যেতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন,

> ''কিছুদিন ওইভাবে অঙ্গনমঞ্চ আর প্রোসেনিয়াম, দুটো একসঙ্গে চলার পরে আমি বুঝতে পারি যে, এতে চলবে না। একটা প্রচণ্ড টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে— একদিকে প্রোসেনিয়মে নিয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছে, আর আমার দিক থেকে অঙ্গনমঞ্চের টান।''[৫৬]

এইভাবে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত বাদল সরকার একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান। শতাব্দী-কে ভেঙে দিয়ে আবার নতুনভাবে শতাব্দী গড়ে তুললেন। সেই মতো শতাব্দী-র পুরোনো সহকর্মী আর কিছু নতুন সদস্য নিয়ে তৈরি হলো নতুন তথা তৃতীয় পর্বের শতাব্দী। ১২ নভেম্বর, ১৯৭২ 'স্পার্টাকুস' নাট্য প্রযোজনা থেকে বাদল সরকার পাকাপাকি চলে আসেন অঙ্গনমঞ্চে। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে সংযোজিত হলো একটি নতুন নাট্যধারা, যার পোশাকি নাম থার্ড থিয়েটার। প্রশ্ন হল প্রসেনিয়াম থিয়েটারের একজন সফল নাট্যকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েও কেন তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ভিন্ন পথ বেছে নিলেন? তাঁর প্রবর্তিত থার্ড থিয়েটার স্বরূপ কী, সেই সংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে।

তথ্যসূত্র:

১. চৌধুরী, দর্শন : বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৫, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৭, কল-৭৩, পৃ. ৪১-৪২

২. সরকার, বাদল : বাদল সরকারের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'থিয়েটারি গল্প: আদিপর্ব' ঋতদীপ ঘোষ সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ডিডি ১৮/১১ সল্টলেক, কলকাতা-৬৪, পৃ. ১২

৩. তদেব : পৃ. ১২

৪. সরকার, বাদল : পুরনো কাসুন্দি ১ম পর্যায়, লেখনী, প্রথম প্রকাশ মে, ২০০৬, পৃ. ১৬১

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ৩৪

৬. তদেব : পৃ. ৩৬

৭. তদেব : পৃ. ৩৫

৮. তদেব : পৃ. ৩৭

৯. তদেব : পৃ. ৩৭

১০. তদেব : পৃ. ৩৭

১১. তদেব : পৃ. ৩৮

১২. সরকার, বাদল : পুরনো কাসুন্দি ২য় খণ্ড, লেখনী, প্রথম প্রকাশ মে, ২০০৭, পৃ. ৫৩

১৩. বাদল সরকারের সঙ্গে দেবাশি মজুমদারের সাক্ষাৎকার : বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, ৬ বর্ষ ২ সংখ্যা, পৃ. ১০৮

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা, সায়ক নাট্যপত্র সংকলন, বিশেষ সংকলন সংখ্যা, ১০ (১৮), ২০১১, প্রকাশ সায়ক, পৃ. ১৩৬-৩৭

১৫. সরকার, বাদল : পুরনো কাসুন্দি ২য় খণ্ড, লেখনী, প্রথম প্রকাশ মে, ২০০৭, পৃ. ৯৯-১০০

১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ৫৮

১৭. রায়, কুমার (সম্পাদনা) : বহুরূপী বিশেষ সংখ্যা, বহুরূপী প্রযোজনা ২, সংখ্যা ৭০, ১০ অক্টোবর ১৯৮৮, উক্ত সংখ্যায় সংকলন ২০/প্রলাপ শিরোনামে' ৩ নভেম্বর ১৯৪০-র নাউ' পত্রিকার রিভিউ থেকে উদ্ধৃটি তুলে ধরা হল, পৃ. ৬২

১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা, সায়ক নাট্যপত্র সংকলন, বিশেষ সংকলন সংখ্যা, ১০ (১৮), ২০১১, প্রকাশ সায়ক, পৃ. ৫৯

১৯. তদেব : পৃ. ৬০

২০. সরকার, বাদল : পুরনো কাসুন্দি ২য় খণ্ড, লেখনী, প্রথম প্রকাশ মে, ২০০৭, পৃ. ৯৯

২১. বিভাস চক্রবর্তীকে দেওয়া বাদল সরকারের সাক্ষাৎকার, নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন, ১৬ ১৯৯৯, ৬৮, ফিয়ার্স লেন, কল-৭৩, পৃ. ২৫৩

২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা, সায়ক নাট্যপত্র সংকলন, বিশেষ সংকলন সংখ্যা, ১০ (১৮), ২০১১, প্রকাশ সায়ক, পৃ. ৬১

২৩. দে, সন্ধ্যা : অন্যধারার থিয়েটার : উৎস থেকে উজানে, মৌহরি, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪১৪, ৫১ সেন্ট্রাল রোড, যাদবপুর, কল-৩২, 'কবিকাহিনী' নাটকের অভিনয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে সন্ধ্যা দে 'আনন্দবাজার পত্রিকায় রিভিউ ব্যবহার করেন। এখানে সেটিই অপরিবর্তিত রেখে তুলে দেওয়া হয়েছে। পৃ. ২০৮

২৪. তদেব : কালান্তর পত্রিকার রিভিউ ব্যবহার করেছেন, পৃ. ২০৮

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ৬১

২৬. তদেব : পৃ. ৬১-৬২

২৭. তদেব : পৃ. ৬২

২৮. তদেব : পৃ. ১৪

২৯. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা-১৬, পঙ্কজ মুন্সীর লেখা, 'অনবগত বাদল সরকার' শীর্ষক প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য

আকাদেমি, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৯৫।

৩০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা, সায়ক নাট্যপত্র সংকলন, বিশেষ সংকলন সংখ্যা, ১০ (১৮), ২০১১, প্রকাশ সায়ক, পৃ. ৬৪

৩১. তদেব : পৃ. ৬৪

৩২. বিভাস চক্রবর্তীকে দেওয়া বাদল সরকারের সাক্ষাৎকার, নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন, ১৬ ১৯৯৯, ৬৮, ফিয়ার্স লেন, কল-৭৩, পৃ. ২৫৪

৩৩. তদেব : পৃ. ২৫৪

৩৪. তদেব : পৃ. ২৫৪

৩৫. তদেব : পৃ. ২৫৪

৩৬. তদেব : কালান্তর পত্রিকার রিভিউ ব্যবহার করেছেন, পৃ. ৯৫

৩৭. সরকার, বাদল : নাটকসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'আবু হোসেন'-এর মুখবন্ধ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৯, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৬২

৩৮. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা, প্রথমপ্রকাশ, বইমেলা ৩১ জানুয়ারি ২০১২, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৩৬

৩৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা, সায়ক নাট্যপত্র সংকলন, বিশেষ সংকলন সংখ্যা, ১০ (১৮), ২০১১, প্রকাশ সায়ক, পৃ. ৬৬

৪০. প্রতিভা অগ্রবালের লেখা : 'প্রসেনিয়ম থিয়েটারের নাটককার বাদল সরকার' শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃ. ৬৭

৪১. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার: অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ২০১৭, কল-২৬, পৃ. ৬১

৪২. সরকার, বাদল : নাটকসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'বড়ো পিসীমা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১০৯-১১০।

৪৩. সরকার, বাদল : এবং ইন্দ্রজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি

বসু, পৃ. ২

৪৪. সরকার, বাদল : নাটকসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, 'বাকি ইতিহাস', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৬৪-৬৫

৪৫. তদেব : 'পাগলা ঘোড়া' নাটক, পৃ. ৩৮২

৪৬. তদেব : পৃ. ৩৯৩

৪৭. তদেব : পৃ. ৪০১

৪৮. তদেব : পৃ. ৪২৫

৪৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ৫৯-৬০

৫০. তদেব : পৃ. ১২৭

৫১. তদেব : পৃ. ১২৯

৫২. তদেব : পৃ. ১২৯

৫৩. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা, প্রথমপ্রকাশ, বইমেলা ৩১ জানুয়ারি ২০১২, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৩৭

৫৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১২৪-১২৫

৫৫. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা-১৬, পঙ্কজ মুন্সীর লেখা, 'অনবগত বাদল সরকার' শীর্ষক প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৯৭

৫৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ৬৮